জীববৈচিত্র্য : একটি সাধারণ ধারণা ও কিছু কর্মকাণ্ড

*পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ বা প্রাণী জগতের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এইসব জীব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে পড়বে। অথচ মানব সমাজের উন্নয়নে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় মাত্র এই সেদিন—১৯৯২ সালে, 'জীববৈচিত্র্য চুক্তি'—CBD পেশ করে। CBD চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বিশ্বের ১৯৬-টি দেশের অন্যতম হল ভারত। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এদেশে নথিভুক্ত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও বেশি এবং প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা প্রায় লক্ষের কাছাকাছি। আর এদেশের ৩ শতাংশেরও কম ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিকারী রাজ্য আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা দু'টি যথাক্রমে সাত হাজার ও এগারো হাজারের মতো। এই জীববৈচিত্র্যই আজ সংকটের সম্মুখীন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বিশ্ব-জুড়েই এক অবস্থা। এই সংকটের কারণ এবং সেই সূত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্ব, দেশ ও রাজ্যে গৃহীত বিবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় অবশ্যই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ। গত ২২ মে পালিত আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে নিবন্ধটি লিখেছেন—***ড. সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ**

Biodiversity বা জীববৈচিত্র্য' কথাটির সঙ্গে আজ অনেকেরই কমবেশি পরিচিত—বিশেষ করে শিক্ষিত মহল। কিন্তু খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পারেন যে এই 'জীববৈচিত্র্য' আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের খাওয়া-পরা-বেঁচে থাকা সবটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। একটাও খাদ্যের কথা ভাবতে পারা যায় না—যেখানে কোনও-না-কোনও উদ্ভিজ বা প্রাণীজ উপাদান নেই। যে সূতোগুলো দিয়ে আমাদের জামা-কাপড় তৈরি হয় তার বেশিরভাগটাই উদ্ভিদ বা প্রাণীসম্পদ নির্ভর এবং সেগুলোই বেশি আরামদায়ক। আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ত-একঘেয়ে জীবন থেকে মন-প্রাণকে আরাম দিতে আমরা ছুটে যাই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে—অচেনা-অদেখা জীবসম্পদের সান্নিধ্য পেতে। আমাদের রোজকার জীবনে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ-প্রাণীর তাৎপর্য ঠিক এখানেই। অথচ বিষয়টি এখনও অতখানি গুরুত্ব আদায় করতে পারেনি। শুধু বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই 'জীববৈচিত্র্য' বিষয়ক আলাপ-আলোচনা এখনও সীমাবদ্ধ।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট জায়গার জীব-সমষ্টি এবং তাদের বাসস্থানকে একসাথে সেই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বলা হয়। এর মধ্যে খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অকোষীয় বা এককোষী অণুজীব বা জীব যেমন আছে, তেমনই ছোট-বড় গাছ-পালা, পশু-পাখী সবই আছে। আমরা 'মানুষ'-ও এর বাইরে নই। মানুষ এই জীববৈচিত্র্যের একটি উপাদানমাত্র। আর যেহেতু বাস্তুতন্ত্রের (Eco-system) উপর অনেকাংশে নির্ভর করে জীবের প্রকারভেদ—সেই জন্য বাস্তুতন্ত্র-ও জীববৈচিত্র্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য একে-অপরের পরিপূরক (সারণি-২)।

পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ বা প্রাণী জগতের কোনওই ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওই সব জীব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে—মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা এই সত্যটি অনুধাবন করে মানুষের জীবনে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে জানাতে শুরু করেন গত শতকের আটের দশক থেকে। আটের দশকের শেষদিক থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো দাবি উঠতে থাকে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Dr. E.O. Wilson 'Biodiversity' নামে একটি বই সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন ১৯৮৮ সালে। ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই দাবির স্বপক্ষে আওয়াজ জোরাল হয়। অবশেষে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো শহরে U.N. Conferance on Environment & Development আয়োজিত বসুন্ধরা সম্মেলনে (Earth Summit) 'জীববৈচিত্র্য চুক্তি' (Convention on Biological Diversity সংক্ষেপে CBD) পেশ করা হয়। এই প্রথম সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল মানবসমাজের উন্নয়নে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকাকে। কন্‌ভেন্‌শন্‌ অনুযায়ী কোনও দেশের জীবসম্পদের উপর সেই দেশের সার্বভৌম অধিকার। পাশাপাশি দেশের জীবসম্পদ সংরক্ষণ (Conservation) ও তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার (Sustainable use)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্যও সেই দেশের। ভারত ১৯৯৩ সালে এই Convention-এ স্বাক্ষর করে। এখনও পর্যন্ত ১৯৬-টি দেশ (Countries) এই Convention-এ স্বাক্ষর করেছে। ব্যতিক্রম পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশের দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

CBD-তে স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমাদের দেশের জীবসম্পদের উপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। একইরকমভাবে তার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের দায়িত্বও আমাদের উপরই ন্যস্ত হল। ভারতে যে কাজটি প্রথম করা হয়, তাহল আমাদের দেশে কত ধরনের/প্রকারের জীবসম্পদ আছে তার একটি হিসাব-নিকাশ করা। তারপরের কাজটি ছিল এই সম্পদ সংরক্ষণের একটি পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা। অবশেষে, ২০০২ সালে একটি আইন প্রণয়ন—জীববৈচিত্র্য আইন (The Biological Diversity Act) এবং ২০০৪ সালে এ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (The Biological Diversity Rules) প্রকাশ। এই আইন প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি—জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্যের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জীবসম্পদ ব্যবহারে উদ্ভূত লাভের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য দেশে একটি ত্রিস্তরীয়

কাঠামো তৈরি করা হয়। জাতীয় স্তরে—জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (National Biodiversity Authority), রাজ্য স্তরে—রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (State Biodiversity Board) এবং স্থানীয় স্তরে (Local Body)—জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি (Biodiversity Management Committee)। ২০০৩ সালে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়—যাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন চেন্নাই শহর থেকে। এই কর্তৃপক্ষের উপরই প্রধান দায়িত্ব—দেশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার।

ভারতবর্ষের মাত্র ২.৭ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ এখনও পর্যন্ত যত সংখ্যক জীব তালিকাভুক্ত হয়েছে সারা দেশ থেকে তার প্রায় ১২ শতাংশের হদিস পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গে থেকেও। বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ—বরফ ঢাকা পাহাড়, তরাই, নদী-নালা বাহিত সমভূমি, রুক্ষ-শুষ্ক লালমাটির অঞ্চল, উপকূল অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্যকে করেছে সমৃদ্ধ। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১০০০ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য) প্রজাতির প্রাণী ও প্রায় ৭০০০ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) প্রজাতির উদ্ভিদ তালিকাভুক্ত করা গেছে। রাজ্যের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। প্রচুর সংখ্যক মানুষের বিশেষত, গ্রামের দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণির খাবার, ওষুধ-পত্তর ও জীবন ধারণ (Livelihood) এখনও সরাসরি বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ-প্রাণীর উপরই নির্ভরশীল (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

এই জীববৈচিত্র্য আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, বিশ্বজুড়েই এক অবস্থা। তার মূল কারণ আবার আমরা—মানুষ। সেই জন্যই এই বিষয় নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা-পরিকল্পনা। সমস্যা-গুলোও কম-বেশি একই ধরনের।

জনসংখ্যার চাপ বা জনবসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক অনন্য সমস্যা। বিপুল সংখ্যক মানুষের থাকা-খাওয়ার সংস্থান করতে বাস্তুতন্ত্রের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বনভূমি পরিণত হচ্ছে কৃষিজমি বা চারণভূমিতে। কৃষিজমিতে উঠছে ঘর-বাড়ি। জলাভূমিও বাদ যাচ্ছে না। ফলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে সেখানকার উদ্ভিদ-প্রাণী বৈচিত্র্য। সেখানকার আদি

সারণি-১
দেশ ও রাজ্যে এযাবৎ তালিকাভুক্ত উদ্ভিদ বৈচিত্র্য

বিভাগ	প্রজাতি সংখ্যা	
	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
ব্যাকটিরিয়া	৮৫০	৯৬
শৈবাল	৬৫০০	৮৬৫
ছত্রাক	১৪৫০০	৮৬০
লাইকেন	২০৫১	৬০০
ব্রায়োফাইটা	২৮৫০	৫৫০
টেরিডোফাইটা	১২০০	৪৫০
ব্যক্তবীজী	৬৪	২১
গুপ্তবীজী	১৭৫০০	৩৫৮০
মোট	৪৫৫১৫	৭০২২

সূত্র : স্যানাল ইত্যাদি, ২০১২

সারণি-২
দেশ ও রাজ্যে এযাবৎ তালিকাভুক্ত প্রাণীবৈচিত্র্য

বিভাগ	প্রজাতি সংখ্যা	
	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
প্রোটোজোয়া	৩৫০০	১১৩৬
পরিফেরা	৫০০	১৬
সিডারিয়া	১০৪২	২৩
সিটেনোফোরা	১২	২
প্ল্যাটিহেলমিনথেস	১৬৫০	২৪৮
গ্যাসট্রোট্রিচা	১০০	২৪
কিনোহাইনচা	১০	৫
নেমাটোডস	২৯০২	৩০৬
সিপানকিউলা	৩৫	৩
মোলাসকা	৫১৫২	২৭৪
একোওরা	৪৩	৩
এ্যানেলিডা	১০০০	১৯৪
এ্যানথ্রোপোডা	৭৪১৭৫	৬৭৮৫
ব্রাইজোয়া (বিশুদ্ধ জল)	২০০	৯
ইকিনোডারমাটা	৭৭৯	২২
হেমিকরডাটা	১২	১
মৎস্য	৩০২২	৬১০
উভচর	৩৪২	৩৯
সরীসৃপ	৫২৬	১৪৮
পক্ষী	১২৩৩	৮৪৬
স্তন্যপায়ী	৪২৩	১৮৮
মোট	৯৬৬৫৮	১০৮৮২

সূত্র : স্যানাল ইত্যাদি, ২০১২; পাণ্ডে এবং অরোরা, (Eds.) ২০১৪

বাসিন্দাদের মধ্যে যারা পারছে তারা অন্য জায়গা খুঁজে চলে যাচ্ছে, যারা পারছে না তারা চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, রাসায়নিক ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রকৃতি-পরিবেশ নির্বিশেষে একই ধরনের চাষ পদ্ধতির সৌজন্যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ধানের/মাছের বিভিন্নতা/ ভবিষ্যতের জন্য যা একেবরেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইচ্ছেয় বা আমাদের অজান্তে কোনও প্রজাতির অণুজীব-উদ্ভিদ-প্রাণী আর এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকছে না—ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে। অনেকক্ষেত্রেই তারা নতুন বাস্তুতন্ত্রে খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে, আর সেখানকার আদি বাসিন্দাদের স্থানচ্যুত করছে। স্থানচ্যুত জীবদের দেখা দিচ্ছে অস্তিত্ব-সংকট। যেমন, কচুরীপানা—বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এখন এটি একটা সমস্যা। কচুরীপানা নেই এমন জলাশয় দেখতে পাওয়া ভার এবং ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা খুব তাড়াতাড়ি পুরো জলাশয়ে বিস্তার লাভ করে। তাতে সেই জলাশয়ের আদি বাসিন্দাদের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

ক্রমবর্দ্ধমান দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলোপের আর একটি প্রধান কারণ। বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব আমাদের পশ্চিমবঙ্গও এড়াতে পারে না। অসহনীয় গরম, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, অসময়ের স্বল্পস্থায়ী প্রবল বৃষ্টি—সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব, অল্প কয়েকদিনের জন্য ঠাণ্ডা—এসবই তার নিদর্শন। এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্যের উপর। বড়-বড় নদ-নদী বছরের বেশিরভাগ সময়েই থাকছে প্রায় জলশূণ্য। এবছর তো গঙ্গার জলস্তর এতটাই নিচে নেমেছে যে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তার উপর আছে কৃষিক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত রাসায়নিক সার-ওযুধ। যেগুলি জলে ধুয়ে পড়ছে বিভিন্ন জলাশয়েই। তাছাড়াও আছে কারখানা বা অন্যান্য জায়গার জলবাহিত বর্জ্য। একে জলের স্বল্পতা, তার উপর রাসায়নিক জলের জীবদের অবস্থাকে করে তুলেছে সঙ্গীণ। এছাড়াও আছে লাগামছাড়া বিভিন্ন আকার-প্রকারের প্লাস্টিক বা ওই ধরনের অবিয়োজিত জিনিসের ব্যবহার। যা জলে-স্থলের

সারণি-৩
রাজ্যে দানাশস্য ব্যতীত অন্যান্য ফসলের বৈচিত্র্য

		সংখ্যা			সংখ্যা
সব্জি	আলু	২+	মশলা	লঙ্কা	১২
	বেগুন	২৫		আদা	২+
	বাঁধাকপি	১৮	বাগিচা শস্য	নারকেল	৫
	ফুলকপি	২২		সুপারী	৩
	টমেটো	১৭	তন্তু শস্য	পাট	২
	ট্যাঁরস	১৫		মেসটা	১০
	শশা	১১	ফুল		অসংখ্য প্রকার
ফল শস্য	আম	১৫০+	ওষধি উদ্ভিদ		৭৫০ বাণিজ্যিকভাবে সংগৃহীত
	কলা	২৫			
	পেয়ারা	৮			
	আনারস	৬			
	লিচু	৭			

সূত্র : ঘোষ, এ.কে., ২০১৩

সারণি-৪
এযাবৎ রাজ্য জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রস্তুতি

জেলার নাম	ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি		পৌরসভা/কর্পোরেশন	
	ব্লক সংখ্যা পঞ্চায়েত সমিতি	জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা-পনা কমিটি সংখ্যা	পৌরসভা সংখ্যা/ কর্পোরেশন	জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থা-পনা কমিটি সংখ্যা
দার্জিলিং	১২	৬	৫	২
জলপাইগুড়ি	৭	১	৩	—
আলিপুরদুয়ার	৬	২	১	—
কোচবিহার	১২	৭	৬	১
উত্তর দিনাজপুর	৯	২	৪	২
দক্ষিণ দিনাজপুর	৮	৪	২	—
মালদা	১৫	১৫	২	২
মুর্শিদাবাদ	২৬	৭	৭	২
পুরুলিয়া	২০	৩	৩	—
বাঁকুড়া	২২	১২	৩	—
বীরভূম	২০	৬	৬	১
নদীয়া	১৭	১৫	১০	৬
বর্ধমান	৩১	১৬	১১	২
হুগলী	১৮	৫	১২	৪
হাওড়া	১৪	৬	৩	—
উত্তর ২৪ পরগণা	২২	৩	২৮	৫
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৯	১৩	৭	১
উত্তর মেদিনীপুর	২৫	২২	৫	৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	২৯	২২	৮	১
মোট	৩৪৩	১৬৭	১২৭	৩০

জীববৈচিত্র্য বেঁচে থাকার পরিপন্থী। অনেক সময়েই শোনা যায় কোনও জায়গার হঠাৎ হঠাৎ গবাদিপশু মারা যাচ্ছে। তাদের অনেকের পেট থেকেই বেরিয়েছে প্লাস্টিকের প্যাকেট বা ওই ধরনের জিনিস। আর দূষণকে শোষণ করে আমাদের পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলে যে গাছপালা, তাদেরকে ধ্বংস করেই আমরা আরও দূষিত করে তুলছি আমাদের চারপাশ। শুধু আমাদের নয়, টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ছে সমগ্র জীবজগতের।

অন্যতম কারণ না হলেও, দারিদ্র্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি বড় কারণ। গরিব মানুষ, বিশেষ করে যারা জঙ্গল বা জঙ্গলের আশেপাশে থাকে, নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই বনের গাছপালা কাটে। গরু-ছাগলকে চরতে পাঠায় জঙ্গলে। জেনে বা না জেনে নষ্ট করে অনেক অমূল্য বনজসম্পদ। সুন্দরবনের খাঁড়ি-নদীর জলে জীবনকে বাজি রেখে 'মীন' ধরে অনেক মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা। যারা চিংড়িচাষ করে তাদের কাছে সেগুলো বিক্রি করে কোনরকমে সংসার চলে। কিন্তু, সেই 'মীন' ধরতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে অসংখ্য অন্যান্য প্রাণীর (ছোট) ডিম ও বাচ্চা। জীবিকা নির্বাহের অন্য পন্থা না দেখানো পর্যন্ত তাদের এই অভ্যাস চলতে থাকবে।

শুধু জনসংখ্যার চাপ নয়, আমাদের আকাশ-ছোঁয়া চাহিদা, লোভ, জীবনশৈলীর পরিবর্তন জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। আমরা চাই তাৎক্ষণিক লাভ। তার জন্য প্রকৃতি থেকে আহরণ করছি যথেচ্ছ জীবসম্পদ, যেন-তেন প্রকারে। ব্যবহার করছি অনিয়ন্ত্রিতভাবে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে প্রচুর ঔষধি গাছ পাওয়া যায়, যার বেশিরভাগই চাষ হয় না। অথচ সেগুলো যথেচ্ছভাবে আমরা সংগ্রহ করছি, উৎপাদনশীলতার কথা না ভেবেই, তাৎক্ষণিক লাভের আশায়। অনেক গাছের ফল বা বীজ পেড়ে নিচ্ছি একেবারে গাছ খালি করে। আমাদের প্রথা ছিল বছরের একটা সময়ে ইলিশ মাছ না ধরা বা না খাওয়ার। তা ইলিশ মাছের বংশবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করত। এখন শত প্রচারেও ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ হয় না। আইন করেও বন্ধ করা যায় না ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ ধরা, বিক্রি বা কেনা। শহরের মধ্যে বা শহর-লাগোয়া জায়গায় একটুও ফাঁকা জমি বা ছোট জলাশয় বাকি থাকে না বাড়ি তৈরি হতে।

এতসব নেতিবাচক কারণ থাকা সত্ত্বেও জীববৈচিত্র্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অনন্য। ভারতের আয়তনের মাত্র ২.৭ শতাংশ জায়গা নিয়ে থাকা এই রাজ্যে ভারত থেকে লিপিবদ্ধ হওয়া জীবসম্পদের প্রায় ১২ শতাংশ এখানে পাওয়া যায়। তা সম্ভব হয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য। পাহাড়, তরাই, নদী বিস্তৃত সমভূমি, লাল কাঁকুড়ে মাটির অঞ্চল, বালুকাময় এবং কাদামাখা উপকূল পশ্চিমবঙ্গকে করে তুলেছে জীবসম্পদে সমৃদ্ধ। নথিভুক্ত প্রায় ১১০০০ প্রজাতির প্রাণী এবং ৭০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে অনেক প্রজাতিই এখন সংকটের মুখে। ২০১২ সালের একটি পরিসংখ্যানে উল্লেখ আছে ১৫২ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ১২০ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। সাম্প্রতিক আর একটি নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯৮৫-২০০৫ সালের মধ্যে ৭-টি স্তন্যপায়ী, ১৪-টি পাখী এবং ১৩-টি মাছের প্রজাতি আর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবৈচিত্র্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ধানের বৈচিত্র্য। 'সবুজ-বিপ্লব' পূর্ববর্তী সময়ে এই অঞ্চলে প্রায় ৫৫০০ ধরনের ধানের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। ২০০৭ সালের একটি হিসাব দেখাচ্ছে সংখ্যাটি এসে ঠেকেছে ৪৬৭-তে। এছাড়া অন্যান্য সবজী-ফুল-ফলের বৈচিত্র্যেও এই রাজ্য সমৃদ্ধ।

এই জীববৈচিত্র্যর উপর নির্ভর করে অনেক মানুষের জীবন ধারণ। এখনও রাজ্যের কমবেশি ৬৫ শতাংশ মানুষের নির্ভরশীলতা কৃষির উপর। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ জলজ প্রাণীসম্পদের উপর তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। এর পাশাপাশি আছে বনজসম্পদ, প্রাণীজসম্পদ, ঔষধী গাছপালা ইত্যাদি আরও অনেক জীবসম্পদ। তথ্য বলছে প্রায় ১০,০০০ মানুষ শুধুমাত্র ফুলঝাড়ু ব্যবসার সাথে যুক্ত। সুস্বাদু কাঁকড়া (Mucrab)-র উপর নির্ভরশীলতা প্রায় এক লক্ষ মানুষের। একটি পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গে জীবসম্পদের বাজার বছরে প্রায় দুই লক্ষ কোটি। এর বাইরে আছে প্রকৃতি বা জীবসম্পদ নির্ভর ট্যুরিজম। এই ধরনের অনেক সম্পদ এই রাজ্যে আছে, যার উপযুক্ত ব্যবহার আরও অনেক মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থান করতে পারে।

রাজ্যের ভৌগলিক আয়তনের (৮৮৭৫২ স্কোয়ার কিলোমিটার) ১৩.৩৮ শতাংশ (১১৮৭৯ স্কোয়ার কিলোমিটার) অঞ্চল বনভূমি হিসাবে নির্ধারিত। Dir. of Forest 2013-14

সারণি-৫
এযাবৎ রাজ্যে জন-জীববৈচিত্র্য নথি **PBR** প্রস্তুতি

সর্বমোট প্রস্তুত হয়েছে	১০০৪-টি নথি
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে	৫০ "
মৌজা স্তরে	৩৪ "
পৌরসভা	১২ "

রাজ্যের নির্ধারিত জঙ্গল (designated forest)-বহির্ভূত এলাকার জীববৈচিত্র্য দেখা-শোনা (management) ও তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার (sustainable use) নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের উপর। জীববৈচিত্র্য আইন অনুসারে ২০০৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (West Bengal Biodiversity Board) তৈরি হয়। শুরু থেকেই পর্ষদ জীববৈচিত্র্য আইন রূপায়ণে সচেষ্ট। আইন অনুসারে প্রত্যেক 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' (local body)-কে তাদের নিজ এলাকার জন্য একটি 'জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি' (Biodiversity Management Committee) গঠন করতে হবে। সেই সমিতির প্রাথমিক কাজ হবে এলাকার মানুষকে দিয়েই সেখানকার 'জন-জীববৈচিত্র্য নথি' (People's Biodiversity Register) তৈরি করা। নথিতে থাকে এলাকার ভূমিচিত্র (landscape) ও ভূমির ব্যবহার; জীবনচিত্র (lifescape)—কৃষি ও পশুপালন-সহ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর হাল-হকিকৎ—তারা কোথায় থাকে, কেমন দেখতে, মানুষের কী উপকার-অপকার করে, স্বাভাবিকভাবেই আছে, না হারিয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি; জনচিত্র (peoplescape)—জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষজনের উপস্থিতি-পেশা-জীববৈচিত্র্যের উপর তাদের নির্ভরতা, জীববৈচিত্র্য নিয়ে তৈরি হওয়া পরম্পরালব্ধ জ্ঞান ও প্রথা (traditional knowledge and practice) এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত তাদের ধারণা-অনুভূতি-চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি। মৌজা

(revenew village) বা গ্রামপঞ্চায়েত বা পৌরসভা ধরে ধরে তৈরি হওয়া এইসব নথি সেখানকার এক অমূল্য সম্পদ। তার উপর নির্ভর করে অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া যায়—যা পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে অত্যন্ত উপযোগী। রাজ্য পর্ষদ এই কাজে সহায়কের (Falicitator) ভূমিকা পালন করছে। জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি গঠন থেকে জন-জীববৈচিত্র্য নথি তৈরি করা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে পর্ষদ সক্রিয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৯৫-টি সমিতি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও পৌরসভায়। ১০২-টি জন-জীববৈচিত্র্য নথি তৈরি হয়েছে এইসব সমিতির মাধ্যমে। আরও প্রায় ৭০-টি জায়গায় এই কাজ চলছে। এই কাজের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে সচেতন করা গেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উৎসাহিত করা গেছে। এইসব মানুষের সাহায্যেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কিছু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের কাজ করা হচ্ছে। যার মধ্যে আছে দেশীয় ধান, স্থানীয় মাছ সংরক্ষণ; অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া গাছ-পালা ফিরিয়ে আনা; ঠাকুরের থান বা মাজার ঘিরে থাকা ছোটখাট জঙ্গল রক্ষা করা ইত্যাদি। এইসব করতে গিয়ে দেখা গেছে যে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে মানুষের সচেতনার অত্যন্ত অভাব এবং তা সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই। আমাদের মানসিকতা প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ দেবে, আমরা নিয়েই যাব। প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে আমাদেরও কিছু আছে—সেটা আমরা মনেই করি না। পর্ষদ এই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে প্রথম থেকেই সক্রিয়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। তাদের নিয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি প্রায়ই করা হয়। উদ্ভিদ-প্রাণী কিভাবে চেনা যাবে—খুব সাধারণভাবে তার উপর 'মেঠো বই' (field guide) প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের জীববৈচিত্র্য নিয়ে বেশকিছু অনুসন্ধানমূলক গবেষণার কাজও পর্ষদ করছে। কত ধরনের ধান এখনও পাওয়া যাচ্ছে এবং কোথায় কোথায়; কত ধরনের মাছ পাওয়া যায়; কত ধরনের ছত্রাক (Fungus) পাওয়া যায় এবং তার কোনগুলো মানুষ ব্যবহার করে; প্রজাপতির হিসাব-নিকাশ; কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদের উপর জঙ্গল ও জঙ্গলের আশেপাশের মানুষের নির্ভরতা কতখানি... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের গবেষণা-নির্ভর প্রকাশনাও পর্ষদ করে আসছে। জীববৈচিত্র্য আইন ২০০২ অনুযায়ী রাজ্যের জীবসম্পদ নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চান বা করছেন তাদের রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদকে জানাতে হবে। তাদের বলতে হবে কী কী জীবসম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থল, পরিমাণ এবং ব্যবসার মূল্য। পর্ষদ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবে। যদি দেখা যায় খুব কমে যাওয়া বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ বা প্রাণী নিয়ে ব্যবসার কথা বলা হচ্ছে তাহলে পর্ষদ তার অনুমোদন নাও দিতে পারে। যারা এই ধরনের জীবসম্পদ নিয়ে ব্যবসার অনুমোদন পাচ্ছেন বা পাবেন, তাদের চুক্তিবদ্ধ (agreement) হতে হবে—ব্যবসায়িক লাভের একটি অংশ (সরকার নির্দিষ্ট) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার। পর্ষদ এই কাজটিও শুরু করেছে। প্রায় ৭০-টির মত এই ধরনের আবেদন বিচার-বিবেচনার স্তরে আছে। বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশ বণ্টনে (share) চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। 'রাজ্যের জীববৈচিত্র্য তহবিল'-এর সূচনা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য আইন তৈরি হওয়ার (২০০২) এতদিন পরে আমরা বলছি এইসব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকাণ্ড 'শুরু হয়েছে' বা 'সূচনা মাত্র'। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। চিত্রটা শুধু এ রাজ্যের নয়, সমগ্র ভারতের, এমনকি বোধহয় সারা পৃথিবীর। জীববৈচিত্র্য মানুষের জীবনের ভিত্তি। দিনের শুরু থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে কোন-না-কোনভাবে আমরা এর উপর নির্ভর করি। অথচ আমরা গ্রাহ্য (care) করি না এই দান, উদাসীনতা দেখাই। নিজেদের জীবনের সঙ্গে একে একাত্ম করতে পারি না। আমাদের এই মনোভাব (attitude) জীববৈচিত্র্য নষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ। এখন খুব জরুরি সমস্ত পরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করা। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি হতে হবে পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য কেন্দ্রিক। এই কারণেই এবছরের ২২ মে পালিত হওয়া আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস (International Day for Biological Diversity)-এর মূল ভাবনা ছিল—'Mainstreaming Biodiversity : sustaining people and their livelihoods'। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আশা করা যায় পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য বিষয়গুলি মানুষের ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে আসবে অদূর ভবিষ্যতে। তাহলেই আমাদের জীবন-জীবিকার ধারা সুস্থিত হবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ-এর সিনিয়র রিসার্চ অফিসার। ইমেল : sro.wbbb@nic.in)

তথ্য সূত্র :

- Sanyal, A.K.; Alfred, J.R.B.; Venkataraman, K.; Tiwari, S.K. and Mitra, Sangeeta; 2012. Status of Biodiversity of West Bengal. Published by the Director, Zoological Survey of India, Kolkata.
- Ghosh, A.K. (Ed.), 2013. Status of Environment in West Bengal : Second Citizenis Report. Published by ENDEV-Society for Environment and Development, Kolkata.
- Pands, H.K. and Arora, S. (Eds.); 2014. India's Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity. Ministry of Environment and Forests, Govt. of India.
- Mathew, Jose T. and Mandal, Rupam (Eds.); 2015. Tradable Bioresources of West Bengal Published by West Bengal Biodiversity Board, Kolkata.
- Directorate of Forests, Govt. of West Bengal; 2015. Annual Report 2013-2014.
- West Bengal Biodiversity Board. www.wbbb.nic.in and different awareness materials.
- National Biodiversity Authority, India; 2004. The Biological Diversity Act, 2002 and Biological Diversity Rules, 2004.

উড়কি ধানের মুড়কি / বিন্নি ধানের খই .....

সেই কবেকার কোন ধূসর অতীত থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাম-না-জানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না পেরোনো কৃষকেরা ধানের আদিম প্রজাতি থেকে নানান উদ্ভাবনী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, এক একটা করে বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের ধান তৈরী করেছেন- কখনো বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করে তোলার জন্য আবার কখনো বা রসনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কিম্বা শুধুই নান্দনিক প্রেরণায়। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই, যার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ধান জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে, ১৯৬৫ সাল

পর্যন্তও প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির দেশীয় ধানের সন্ধান পাওয়া যেত। এর মধ্যে কোনো কোনো ধান জন্মাত সুন্দরবনের নোনা মাটিতে, কোনটা শুকনো খটখটে সেচবিহীন জমিতে, কোনটার শীষ ছিল আবার এতটাই উঁচুতে যে সহজেই দক্ষিনবঙ্গের জলাজমিগুলোতে ফলতে পারে। সুগন্ধি চালের মধ্যে ছিল

গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, কালোনুনিয়া, কালোভাত ; সুন্দর সরু চালের মধ্যে সীতাশাল, রূপশাল, বাঁশকাঠি; সুস্বাদু ভাতের জন্য কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙেশাল, চামরমনি; অপরুপ খই তৈরী হত কনকচুর, বিন্নি, ভাসামানিক বা লক্ষ্মীচূড়া ধান থেকে; মুড়ির জন্য রঘুশাল, লাল ঝুলুর, চন্দ্রকান্ত, মুর্গিবালাম আর পায়েসের ছোটদানার চাল হিসেবে তুলসীমঞ্জরী, শ্যামা,তুলসীবকুল আর বৌপাগলি। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা এইসব দেশীয় ধান মানুষের, মাটির আর পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের জন্য ছিল সহায়ক।

"বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল"

অবস্থাটা আমূল পাল্টে যেতে শুরু করলো "সবুজ বিপ্লবের" সূচনা থেকে, গত শতাব্দীর ষাটের দশক নাগাদ। বেশি উত্পাদনশীলতার লোভ দেখিয়ে তথাকথিত উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক,আগাছানাশকের যে ব্যবহার শুরু করা হলো, আজ তার পেছনে বহুজাতিক রাসায়নিক কোম্পানিগুলোর মুনাফা অর্জনের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর যেখানে যেখানে এটা লাগু করা হয়েছিল, সেখানেই। তেমনি স্পষ্ট হয়ে গেছে মানুষ আর পরিবেশের ওপর এই পদ্ধতিতে চাষের ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো। যত নিবিড়ভাবে "সবুজ বিপ্লব"কে গ্রহণ করা হয়েছে